The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 317-337, ISSN 2306-3920

সাম্প্রতিক ভারতীয় চলচ্চিত্রে ‘গ্যাংস্টার’ চরিত্রের মহিমান্বিত রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণ

সালমা সাবিহা*

[**সার-সংক্ষেপ:** ভারতীয় চলচ্চিত্রের রয়েছে নানা আঙ্গিক নানা ধরণ। বর্তমান সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি জনপ্রিয় ধারা হলো গ্যাংস্টারভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। এসব চলচ্চিত্রে গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোকে মহিমান্বিত রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সমাজে যারা নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত এবং নিজেদের দলকে কেন্দ্র করে অপরাধের রাজত্ব কায়েম করে রাখে এমন চক্রের হোতাকে বলা হয় গ্যাংস্টার। সম্প্রতি একটি প্রবণতা দেখা যায় যে, গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে তাদের মহিমান্বিত রূপায়ণের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। সাধারণ দর্শক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের মননে এটা প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এই গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোর আসলে ইতিবাচকতা আছে সমাজের ওপর। কিন্তু এই ধরণের রূপায়ণ যুব সমাজ তথা সামাজিক অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রাখতে পারে।]

মূখ্য শব্দ: ভারতীয় চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র, মহিমান্বিত, গ্যাংস্টার।

প্রায় প্রতি বছর এক হাজারেরও বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ভারতে। ভারতীয় দর্শকরা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পছন্দ করে। গল্প বলার কৌশল একেকটি সিনেমায় একেকরকম হয় এবং সাথে থাকে জমজমাট নাচগানের সংমিশ্রণ। ভারতীয় দর্শকদের আবেগের জায়গা তাদের চলচ্চিত্র। (রেনু, ২০১২)।

চলচ্চিত্র সর্বকলা আত্মিকৃত এক শিল্প, যোগাযোগ ও প্রকাশ মাধ্যম। (সাজেদুল, ২০১১) চলচ্চিত্র মূলত একটি শিল্পমাধ্যম যা অনেক সময় ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে, সমাজে বিদ্যমান অন্যায় আর অসঙ্গতির বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা আর প্রতিবাদ সংহত করার জন্য। (জুনাইদ,২০১৬; ২৩)। বিনোদন লাভই একমাত্র চলচ্চিত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয় বরং একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চিন্তার শাখা-প্রশাখা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। সেখানে এই গ্যাংস্টারভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গবেষণার মূল বিষয় হলো ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে গ্যাংস্টারভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোতে একজন গ্যাংস্টারকে কীভাবে মহিমান্বিত করে দর্শকের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

---

* **সালমা সাবিহা:** প্রভাষক, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

যেহেতু বর্তমান সময়ে গ্যাংস্টারদের জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের আধিক্য দেখা যাচ্ছে তাই এই লেখার লক্ষ্য হল কীভাবে এই চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোকে আমাদের মনের ভেতর ইতিবাচক ভাবে রূপায়িত করা হচ্ছে তা খুঁজে বের করা। গ্যাংস্টার দের নিয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার একটা প্রবণতা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচি নির্ধারণ কার্যাবলি সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাককম্বস ও ডোনাল্ড শ বলেন- "*mass media have the ability to transfer the salience of items on their news agendas to the public agendas*." (Griffin, 2000)। চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম যার সাহায্যে এই চিন্তাগুলোকে জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। ভারতীয় অনেক চলচ্চিত্রের মধ্যে এই গবেষণার জন্য মূলত তিনটি গ্যাংস্টার চলচ্চিত্রকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাই করা হয়েছে। এই চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে সমরূপতা লক্ষ্য করা যায়, নৈতিক বিবেচনার জায়গা থেকে চিন্তা করা হলে এই ধরণের চলচ্চিত্র অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া শেখায়। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ যোগায় এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য এই বার্তাগুলো অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ফলে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বলিউড চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক ধারা হলো গ্যাংস্টারভিত্তিক এবং বায়োপিক সংক্রান্ত সিনেমা। তবে এ ধরণের চলচ্চিত্র তৈরি অগ্রসরতা নাকি নয় তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। গীতা পাণ্ডে তার লেখায় বলিউডের অগ্রসরতা নিয়ে কথা বলেছেন। ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্র গত কয়েক বছর কতখানি অগ্রসর হয়েছে তার উত্তর প্রায় সময় নানা গবেষক খুঁজেছেন। তিনি বলছেন এর উত্তর মূলত হ্যাঁ ও না দুটোই। গত ৭০ বছরের শত শত সিনেমা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পরিচালিত গবেষণা থেকে এর উত্তর পাওয়া যায় হ্যাঁ ও না দুই ক্ষেত্রেই। ভক্তরা সিনেমার তারকাদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, এমনকি তাদের নামে নানা মানত করে এবং দান খয়রাত করে। একইসাথে সমালোচনাও আছে অনেক। আর তার কারণ বলিউডের পশ্চাৎগামী চিন্তা ভাবনা ও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর প্রতি বিদ্বেষ, গায়ের রঙ নিয়ে বৈষম্য প্রভৃতি কারণে। (পাণ্ডে, ২০২১)।

বায়োপিকের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ একদিনে তৈরি হয়নি। ধীরে ধীরে এই জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে। দেবারতী ভট্টাচার্য (প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধি) হিসাব নিকাশ করেছেন এই দশকে বলিউড থেকে দর্শক কী পেলো তা নিয়ে। তিনি তুলে ধরেছেন বায়োপিকের বাজারের কথা। ভারতীয় সিনেমায় প্রথম বায়োপিক ধরা হয় রাজা হরিশচন্দ্র সিনেমাটিকে। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯১৩ সালে। বলিউড সিনেমার বাজারে বায়োপিকের জোয়ার আসে ২০১০ এর দশকে। বিশেষ করে ক্রীড়াজগতের মহারথীদের নিয়ে আত্মজীবনীমূলক ছবির ধারা পাওয়া যায় এই সময়েই। তবে বায়োপিকের এই জোয়ারে মহান ব্যক্তিদের পাশাপাশি গ্যাংস্টারদের জীবনী নিয়ে আগ্রহ চলে আসে ২০১০ এই। এরপর একের পর এক পাওয়া যায় নানাধরণের গ্যাংসটারদের জীবনী নির্ভর সিনেমা (দেবারতি, ২০১৯)।

বেশিরভাগ সিনেমাই হয় নায়ক নির্ভর। তবে এই নায়কনির্ভরতার বাইরে গিয়ে সিনেমা তৈরি ছিলো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর্থার সাক্সের (১৯৭১) তার লেখায় বলেন, আমেরিকান প্রথম গ্যাংস্টার সিনেমা আন্ডারওয়ার্ল্ড যখন তৈরি হয় অনেকের ধারণা ছিলো নায়ক নায়িকার বাইরে গিয়ে এইরকম ভিলেইন নির্ভর সিনেমা তৈরি করলে কতটুকু চলবে বা দর্শক কীভাব এটিকে গ্রহণ করবে তা নিয়ে একধরণের সংশয় ছিলো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই সিনেমা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। দর্শকদের মধ্যে গ্যাংস্টারদের প্রতি একধরণের সুপ্ত ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়, তারা ভিলেইনকেই নায়করূপে দেখতে পছন্দ করে (সাক্স, ১৯৭১)।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাথে মাফিয়ার চক্রের একটা গোপনীয় যোগাযোগ নানাভাবে প্রকাশিত। সঙ্গিতা সিনহা (২০১৬) তার 'মুম্বাই অ্যান্ড দা মাফিয়া ট্রেইল' নামক আর্টিকেলে উল্লেখ করেছেন,

বলিউড তথা হিন্দি সিনেমার অপর নাম বলতে সবাই বুঝে মাফিয়া। বলিউডের সাথে মাফিয়া চক্রের সম্পৃক্ততাকে কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেন মাফিয়া চক্র ও বলিউড একইসাথে বড় হয়ে উঠছে এবং তারা একে অপরের পরিপূরক কিছু ক্ষেত্রে। এই কথাকে অস্বীকার করার উপায় আসলেই নেই। নানাভাবে কালো টাকা সাদা করার রাস্তা হলো বলিউড, এই মাফিয়া চক্রের মূল টার্গেট হলো প্রযোজকদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থমত পছন্দসই সিনেমা তৈরি করানো। (সিনহা, ২০১৬)।

রোনাক দেসাই (২০১৬) ফোর্বস এ 'বলিউডস অ্যাফায়ার উইথ দি ইন্ডিয়ান মাফিয়া' শীর্ষক আর্টিকেলে বলেছেন, আন্ডারওয়ার্ল্ড বা মাফিয়া চক্রের প্রভাব বলিউডে এতটাই বেশি যে কোনো নির্দেশনক, নায়ক, নায়িকা, প্রযোজক অনেক সময় না চাইলেও তাদের কথা মত তাদের কাজ করতে হয়। একধরণের চাপ প্রয়োগ করা হয় তাদের উপর। তিনি আরো বলেন মাল্টিবিলিয়নেয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ড এর মধ্যে খুবই সূক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রি খুব সহজেই গ্যাংস্টার ও রাজনৈতিক নেতাদের কালো টাকাকে গ্রহণ করে এবং তা লগ্নি করতে দেয়। দেখা যায় মাফিয়া চক্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত অভিনেতারা প্রকাশ্যেই মাফিয়াদের নানা পার্টিতে অংশগ্রহণ করছে এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখছে কিংবা বলা যায় রাখতে বাধ্য হচ্ছে। (দেসাই, ২০১৬)।

তাত্ত্বিক কাঠামো

তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে আলোচ্যসূচী নির্ধারণ তত্ত্ব ও প্রচারণা তত্ত্ব নেয়া হয়েছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল ম্যাককম্বস ও তাঁর সহযোগী চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক ডোনাল্ড শো ১৯৭২ সালে 'আলোচ্যসূচী নির্ধারণ' তত্ত্ব অনুযায়ী এবং জনগণ কতটা জানবে, কতটা শুনবে, তা একসময় ঠিক করে দিতেন রাজা ও পুরোহিতবৃন্দ। যা এখন নির্ধারণ করে দেয় গণমাধ্যম। বলা হয় গণমাধ্যম যা সম্প্রচার করেনা তার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে বাস্তবতার উৎস ভাবা হয় গণমাধ্যমকে। গণমাধ্যম যা দেখায় যা শোনায় এবং যা জানায় সাধারণ জনগণ সেটাকেই বাস্তব হিসেবে বিশ্বাস করে। আলোচ্যসূচী নির্ধারণ তত্ত্বের সাহায্যে প্রভাবনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কিছু ভূমিকা রয়েছে যা উল্লেখ করা হল (সামিন, ২০১১)।

- প্রথমে কোনো একটি বিষয়কে সিলেক্ট করে সেটির দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।
- নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক সংবাদ, চলচ্চিত্র, লিফলেট, অনুষ্ঠান নির্মাণ শুরু হয়।
- সহজে বুঝা যায় ও সাধারণ জনগণের আবেগকে ধরতে পারার মত করে বার্তা প্রকাশ করা হয়।
- গণমাধ্যমের ভাষা যেন জনগণের নিজের ভাষা হয় সেভাবে বার্তা প্রচার করা হয়।
- বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট করে বার্তা প্রচারিত হয় যেনো সাধারন জনগণ এর নৈকট্যে পৌছানো যায়।

আলোচ্যসূচি নির্ধারণের কৌশল

মূলত তিনটি পন্থা অবলম্বন করা হয়-
দ্বার রক্ষন
মুখ্যকরণ
কাঠামোকরণ (শাওন্তী ও সামিন, ২০১৪)।

মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ ও মতাদর্শকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে অন্যভাবে নতুন কিছু চিন্তা করার প্রয়াসই হলো প্রচারণা। আর এই বিষয় নিয়ে গভীরে বিশ্লেষণ করার জন্য আলোচনা শুরু হয় প্রচারণা

তত্ত্বের। বেশিরভাগ সময়ই প্রচারণার মূলে থাকে মিথ্যা ও প্রতারণা। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড ডি ল্যাসওয়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই প্রচারণা তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন ক্ষতিকর প্রচারণা থেকে দর্শক-শ্রোতাকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষিত, সমাজবিজ্ঞানী ও এলিট শ্রেণীর মাধ্যমে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (Lasswell, 1938; Baran and Davis, 2008) পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট সংবাদ মাধ্যমগুলো কীভাবে কাজ করছে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অ্যাডওয়ার্ড এস হারমেন ও নোয়াম চমস্কি তাঁদের ম্যানুফ্যাকচারিং কন্সেন্টঃ দ্যা পলিটিকাল ইকোনমি অফ ম্যাস মিডিয়া (১৯৮৮) গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। (চোমস্কি, ১৯৯৮)।

গবেষণা প্রশ্ন

- সাম্প্রতিক সময়ের ভারতীয় চলচ্চিত্রে গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোকে কীভাবে রূপায়িত করা হয়েছে?
- সাম্প্রতিক সময়ের ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোতে গ্যাংস্টার চরিত্রসমূহের উপস্থাপনে কি কোনো ধরণের সমরূপতা রয়েছে?

সিনেমায় বিতর্কিত চরিত্রের মহিমান্বিত রূপায়নের প্রচেষ্টার নিদর্শন খোঁজ

রইস

২০১৭ সালে রিলিজ পাওয়া এই চলচ্চিত্রটির নির্দেশনা দিয়েছেন রাহুল ঢোলাকিয়া এবং প্রযোজনায় ছিলেন শাহরুখ খান পত্নী গৌরি খান, রিতেশ সিধওয়ানি ও ফারহান আখতার। অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও মাহিরা খান। চলচ্চিত্রটি মূলত তৈরি হয়েছে গ্যাংস্টার আব্দুল লতিফের জীবনকাহিনীর ছায়ার ওপর ভিত্তি করে।

আব্দুল লতিফের জীবন ছায়ার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে রইস সিনেমাটি। এই সিনেমায় রইস চরিত্র কে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন দর্শকদের মনের মধ্যে একজন জনদরদী, মানবসেবী, দেশপ্রেমী হিসেবে তার চরিত্রায়ন গেঁথে যায়। রইসের জীবনের গল্প শুরু হয় আহমেদাবাদের সড়ক থেকে। কিশোর বয়সে জুয়ার টেবিলে মদ পরিবেশনার কাজ করা থেকে মদের ব্যবসার সাথে তার সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। আর ধীরে ধীরে অবৈধ মদের ব্যবসায় তার প্রবেশ ঘটে। এর সাথে যুক্ত হয় আরো নানান অপরাধমূলক কাজ। সময়ে সময়ে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে গুজরাটে নিজের অনেক বড় ও অবৈধ মদের ব্যবসা গড়ে তোলে। এর সাথে খুন খারাবি, অপহরণ, পেশাদার খুনি, জমির দালাল এবং দখলবাজ হিসেবেও তার নাম সবাই চিনতে থাকে।

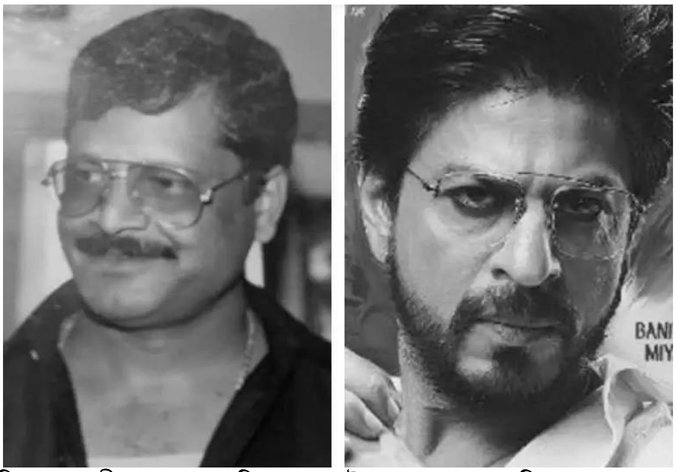

(বাম পাশের ছবিতে বাস্তব জীবনের আব্দুল লতিফ ওরফে রইস এবং ডানপাশে অভিনেতা শাহরুখ খান রইস চরিত্রে)

সিনেমার দৃশ্যপট শুরু হয় ১৯৬০ সালের মাঝামাঝির ঘটনা দিয়ে এবং শেষ হয় ১৯৮০ সালের ঘটনার মধ্য দিয়ে। গুজরাটের মদের ব্যবসার সাথে জড়িত থাকা নিয়ে মূল কাহিনি এগিয়ে যায়।

সিনেমাটিতে দেখা যায়, ছোটবেলা থেকেই রইস এর মধ্যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রবণতা। এলাকায় গান্ধীজীর মূর্তির মুখ থেকে চশমা চুরি করার পর স্কুলের ব্যাগের ভেতর বইয়ের নিচে মদ লুকিয়ে পাচার করতে করতে সে হয়ে যায় সিদ্ধহস্ত। এই পুরো দৃশ্যগুলো যখন দেখানো হয় তার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে একধরণের অহমিকাপূর্ন সঙ্গীত আবহ। এতে করে মনে হয়, সে যথাযথ কোন কাজ করছে। এই সিনেমাটি ছোট থেকে বড় সকলেই দেখছে, শিশুমনে এর প্রভাব অত্যন্ত খারাপভাবে পড়তে পারে। ছোট বেলা থেকেই রইস নেতিবাচক কাজগুলোতে কতটা দক্ষ সেটা অত্যন্ত মহিমান্বিত করে দেখানো হয়েছে।

মায়ের কাছে শোনা ভালো কথার ভুল অর্থ করার একটা প্রচেষ্টা এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে। শুরুতেই একটি ডায়ালগ বারবার বলা হয়েছে আর তা হলো-

কোয়ি ধান্দা ছোটা নাহি হোতা
ধান্দে সে বারকার কোই ধার্ম নেহি হোতা

এর অর্থ হলো- "কোনো কাজই ছোট বড় না, আর কাজের থেকে বড় ধর্ম আর কিছুই না।" সব মা তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে ভালো ভালো উক্তি বলে থাকেন। ছোট রইস এই কথাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছে বলে সিনেমায় দেখানো হয়। তবে এই সংলাপের মাধ্যমে তার পরবর্তী ভুল কাজগুলোকে সে ধর্মের সাথে তুলনা করা শুরু করে কারন তার কাছে তার কাজই হলো ধর্ম, সেই কাজটি কতটুকু সততামূলক সেটার প্রশ্ন কিন্তু এখানে আসেনি। বরং এই সংলাপের মাধ্যমে একধরণের ভুল বার্তা প্রচার করা হচ্ছে যে, সব কাজই আসলে কাজ! এখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকেও কর্ম তথা ধর্মের সাথে তুলনা করা হচ্ছে।

গুজরাট থেকে মুম্বাইতে গিয়ে রইস ছাগলের ব্যবসায়ের কাজে হাত দিতে চায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী একটি বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু এখানে দেখানো হয় রইস সবাইকে মেরে তার অধিকার আদায় করে ফেলে। এতে করে সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছায় যেকোনো ভাবে নিজের কাজ আদায় করে নিতে হবে কোনো নিয়মের মধ্যে না থেকেই। এরপর সে মুসা ভাই নামক মূল চক্রের হোতার খুব কাছে পৌছে যায় এই আচরণের মাধ্যমে! এর মানে এই ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে মানুষের মনে সঠিকরূপে চিত্রায়িত করার মাধ্যমে অন্যায় কাজকে সঠিক হিসেবে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

যখন রইস আপাদমস্তক মদের ব্যবসায়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন একটি সংলাপ বলতে শোনা যায়- *"আব আপনা টাইম শুরু"* এবং এরপরই দেখানো হয়, সে মাজারে চাদর চড়াচ্ছে। অর্থাৎ অন্যায় পথে থেকেও সে যে একজন ধর্মভীরু মুসলমান এটা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সিনেমা শুরুর সময়েও রইস নিজের শরীরে নিজে চাবুক দিয়ে আঘাত করছে এমনটা দেখানো হয়। শিয়া মুসলমানরা নিজেদের প্রভুর প্রতি ভালোবাসা নিদর্শনে মহররমে এই রীতি পালন করে থাকেন। ইয়া হুসেইন ইয়ে হুসেইন বলে নিজের গায়ে চাবুক মারার দৃশ্যটি খুবই আবেগপূর্ণ, এতে করে এমন একটা ভাব আনার চেষ্টা করা হয়েছে রইস অত্যন্ত ধর্মভীরু মুসলিম। অর্থাৎ যেকোন খারাপ কাজকে সঠিকতার রূপ দেয়ার জন্য এরকম কিছু ধর্মভীরুতার দৃশ্য দেখানো হয়েছে যেনো সাধারণ মানুষের চিন্তায় এটা প্রবেশ করে- চরিত্র আসলে একজন খাঁটি মুসলমান।

রইস তার মদের ব্যবসায়ের লাভের টাকা দিয়ে তার এলাকার সবার জন্যে অনেক খরচ করে এবং টমেটোর মধ্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে মদ প্রবেশ করিয়ে সবার বাসায় পাঠায়। এই দৃশ্যটি এমনভাবে দেখানো হয় যে, সবাই খুব খুশি এই জিনিসগুলো পেয়ে। অর্থাৎ জনসাধারণ এই ধরণের কিছু পেলেই

খুশি, কেউ এটা নিয়ে নাখোশ না যে, অবৈধ পথে উপার্জিত উপঢৌকন সাধারন মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হচ্ছে। কালো টাকা সাদা করাই যেখানে মূখ্য উদ্দেশ্য।

এই সিনেমায় পুলিশদের দূর্বল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বরং পুলিশদের থেকে রইসের ক্ষমতা বেশি তা দেখানো হয়েছে। রইসের কথায় নেতারা মিলে পুলিশ প্রধানকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেয়। এছাড়াও পুলিশকে ঘুষ দেয়ার পর তাকে নিজের পায়ের তলায় পরে মাফ চাইতে বলে রইস এবং পুলিশরা তার কথামত তা পায়ের নিচেই থাকে। এছাড়া রইসের সন্তান জন্ম নেয়া উপলক্ষ্যে দেখা যায় পুলিশরাও মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করছে। আর এগুলো দিয়ে এটাই বুঝানো হচ্ছে যে রইস অনেক ক্ষমতাধর একজন যাকে নেতা পুলিশ সবাই সমীহ করে চলত। আরেকটি দৃশ্যে ইচ্ছে করে দেখানো হয়েছে পুলিশ ফাঁড়িতে একজন অফিসার বসে বসে হাতে নেইল পলিশ লাগাচ্ছে। যেটা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় একটি দৃশ্য। ইচ্ছে করে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন মনে হয় পুলিশরা মেয়েদের মত সাজগোজ নিয়েই থাকছে এবং নেইল পলিশ দেয়াকে এখানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যস্বরূপ রূপায়িত করা হয়েছে।

শুরুতে সিনেমায় রইস এর পরিচয় যখন দেয়া হয় তখন এমনভাবে বলা হয়- *"The mind of a businessman and the bravery of a gangster"* এখানে একজন ব্যবসায়ীকে একজন গ্যাংস্টারের সাথে সমান সমান জায়গায় রাখা হলো এই কথাটি দিয়ে আবার একইসাথে গ্যাংস্টারদের অত্যন্ত সম্মানজনক একটা অবস্থান দেয়া হলো, এর মানে গ্যাংস্টার মানেই হলো সাহসিকতার প্রতীক! যারা কষ্ট করে ব্যবসা করে তাদের সাথে যদি এভাবে একই কাতারে গ্যাংস্টারদের রাখা হয় এবং তুলনা করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এই দুটো বিষয়কে এক করে ভাবা শুরু করতেই পারে যে ব্যবসা মানেই হলো গ্যাংস্টার হতে হবে। সৎ পথে উপার্জন করা অপ্রয়োজনীয়।

এই সিনেমায় কিছু আপত্তিকর সংলাপ আছে যেখানে সরকার- রাষ্ট্রকে অবমাননা করা হয়েছে। এমন একটি সংলাপ হচ্ছে- *"ইয়াহা সারকার কা নেহি, ডামলা সেঠ কা চালতা হে,"* যার অর্থ "এখানে সরকারের কোনো কথার মূল্য নেই গ্যাংস্টার রইস ও তার গুরু যা বলবে তাই হবে।" এই কথার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এর মনের মধ্যে তৈরি হতেই পারে যে গ্যাংস্টার সরকার প্রধানের চেয়েও শক্তিশালী।

একটার পর একটা খুন করে যাচ্ছে রইস এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ডগুলোকে গুরুভাবে না দেখিয়ে একটি অপরাধের পরপরই স্বামী হিসেবে রইসের প্রেমসুলভ কর্মকাণ্ডকে দেখানো হয়েছে বারবার। যতবার একটা করে অপরাধের দৃশ্য দেখানো হয় তার পরের দৃশ্যেই রোমান্টিক স্বামী হিসেবে তাকে দেখানো হচ্ছে যে কিনা ঘরের কাজ করে, বউয়ের সেবা যত্ন করে। এর দ্বারা জনসাধারণের চিন্তাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

রইস তথা আব্দুল লতিফ যখন জয়রাজকে মেরে ফেলছে সেই দৃশ্যে দেখানো হয় রইস ইন্নালিল্লাহ পড়ছে। এটা দেখানোর উদ্দেশ্যই হলো দর্শকের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করা যে, রইস মনের দিক থেকে খুবই নরম কিন্তু সে আসলে এই ধরণের কাজ করতে বাধ্য হয়! অন্যায় কে ন্যায্যতার মোড়কে উপস্থাপনের জন্য এইভাবে দৃশ্যটি দেখানো হয়। যেই সময়ের ঘটনা তখন ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছে। এইরকম অবস্থায় যেহেতু রইস নিজে মুসলমান, কিন্তু সে যে এলাকায় থাকে সেখানে হিন্দু মুসলমান একইসাথে বসবাস করে। সব জায়গায় ঝামেলা থাকলেও সিনেমায় দেখানো হয় রইসের এলাকায় এই ধরণের কোনো ঝামেলা ঘটেনা কারণ রইস নিজ বাড়ি থেকে সবার জন্য খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ করে হিন্দু মুসলিম সবার জন্য। এখানে একটি সংলাপ সে বলে- *"ধান্দা কারনেকে সামায় নেহি সোচা কন হিন্দু কন মুসলিম তো আব কিউ?"* এর দ্বারা এটা বুঝানো হয় সে জনদরদি নেতা।

বিরোধী দলীয় নেতা যখন রইসের এলাকায় প্রচারণার জন্য আসে সেখানে সেই নেতার সাথে রইস অত্যন্ত হিংস্র আচরণ করে, মদের বোতল এলাকার সবার কাছে ছড়িয়ে দেয় যেন আগুন লাগাতে পারে! এছাড়াও শারীরিক ভাবে আঘাত করে নেতাকে আহত করে ফেলে রইস। কিন্তু এই পুরো দৃশ্যগুলো এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেখানে এই আচরণগুলোকে একদম সঠিক বলে মনে হয়।

রইস যখন অনেক বড় পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সে এরকম আরেকটি ব্যবসায় নামার প্ল্যান করে যেখানে এলাকার সকল সাধারন জনগন এর কাছ থেকে একটা প্রকল্পের নামে টাকা নিয়ে টাকা দ্বিগুনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এখানে একবারো এটা দেখানো হয়নি এই পুরো পরিকল্পনাটাই ছিলো একটা টাকা আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়া। সিনেমার শেষে এমনটাই দেখানো হয় যেন মনে হয় রইসের স্বপ্ন পূরণ হলোনা।

এই সিনেমার সবথেকে বড় প্রচারণার অংশ হলো এই 'আপনা সাপনা' নামক গৃহ নির্মাণ প্রজেক্ট। দেখানো হয়েছে এই প্রজেক্টি টিই রইসের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, যেন এটি পূরণের জন্যেই সে এতদিন মদের ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিলো। দেখানো হয়েছে রইসে জমানো সমস্ত টাকা ও গৃহ পরিকল্পনার নামে এলাকাবাসীর কাছ থেকে নেয়া টাকা জেলে থাকা, দাঙ্গা ও ইলেকশনের প্রচারণায় প্রায় সবই যখন ব্যয় হয়ে গেছে তখন রইস না পেরে দাউদ ইব্রাহিমের ডান হাত এর কাছে সাহায্যের জন্যে যায়। এমন একটা অবস্থা এখানে দেখানো হয়েছে নিজ ইচ্ছের বিরুদ্ধে রইস যেন তার সাহায্য চাইতে যায়! বিষয়টি সহজ নয়। দাউদ ইব্রাহিমের ডান হাত তখন কৌশলে রইসের মাধ্যমে নৌপথে আরডিএক্স এর মত ভয়ানক বোমা নিয়ে আসায় যার কিছুই রইস টেরও পায়না। যা একদমই অবাস্তব। যেখানে সকল ধরণের মদের চোরাচালান, স্বর্ণ পাচারের মত ঘটনা রইসের অগোচরে ঘটানো অসম্ভব সেখানে রইস তথা আব্দুল লতিফকে একদম নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এই বার্তা প্রচার করা হচ্ছে যে রইস বিষয়টি সম্পর্কে অবগত না এবং জানা মাত্র সে এদের খুন করে ফেলে। ১৯৯৩ সালের মুম্বাই ব্লাস্ট কেসে দাউদ ইব্রাহিমের পর যার নাম আসে তা হলো এই আব্দুল লতিফ। সুতরাং অযথাই এই গ্যাংস্টারকে সাধারন মানুষের চোখে নায়ক হিসেবে রূপায়ণের চেষ্টা করাটাও একধরণের অপরাধ। দেশপ্রেমিক হিসেবে জোর করেই তার অবস্থানকে তৈরি করতে চাওয়া হয়েছে এই ঘটনাটি দেখানোর মাধ্যমে।

শেষ দৃশ্যে এমনভাবে রইসের মরে যাওয়া দেখানো হয় যেখানে পুলিশ অফিসারের কৃতিত্বকে একদমই নগণ্য মনে হবে এবং মনে হবে কেনো দেশ ও জাতির নেতা রইসকে পুলিশ এভাবে মেরে ফেলল। দর্শকদের মনের ভেতর অপরাধী রইসের চাইতে রোমান্টিক, জনদরদী, ধর্মভীরু রইসকে এমনভাবে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যাচ্ছেনা এমন শেষ।

এক কথায় রইস কোনভাবেই একজন খারাপ মানুষ ছিলোনা, গ্যাংস্টার সে নিজ ইচ্ছায় হয়নি এবং বোমা মুম্বাইতেও সে নিজ ইচ্ছায় আনেনি এমনটাই প্রমাণ করার চেষ্টা এই পুরো চলচ্চিত্রে ছিলো। একজন অপরাধী গ্যাংস্টারকে মহিমান্বিত রূপ দান করার ক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রটি সফল ছিলো। আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে একধরণের ভুল ও অবাস্তব ইমেজ নির্মাণ করা হচ্ছে রইস তথা একজন গ্যাংস্টারের জীবন ও কাজ নিয়ে।

ড্যাডি

ড্যাডি সিনেমাটি আরুন গাউলির জীবনীর ওপর নির্মিত যে ছিলো ভারতের মুম্বাইয়ের দাগদি বস্তির এক কুখ্যাত ডন এবং পরবর্তীতে একজন নেতা ও মুম্বাই বোমা হামলার হোতা দাউদ ইব্রাহিমের একজন চিহ্নিত প্রতিপক্ষ। ঘটনার সময়কাল ১৯৭০-১৯৮০ সাল। ড্যাডি সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে অরুন গুলাব গাউলির জীবন নিয়ে। জীবনের শুরু অরুন গাউলি করে ছোটখাটো চুরি, স্মাগ্লিং দিয়ে কিন্তু ক্রমেই কর্মকাণ্ড বড় পরিসরে ঘটানো শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয় কোবরা গ্যাং এর

অপরাধী শাশি রাশাম এবং প্রাসনাথ পাণ্ডের খুনের দায়ে। এরপরে অভিযোগ উঠে শিব সেনা দলের নেতা রামেশ মোরে এবং বালাসাহেব ঠাকরির কাছের আরেক নেতা জয়ন্ত যাদব এবং মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন বুঝারির খুনের দায়ে। এরপরে যেই দায়ে আজও জেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে অরুন গাউলি সেটা হলো আদালতে প্রমাণিত হয় শিব সেনা দলের কর্পোরেটর কামলাকার জামসান্দেকারকে হত্যার জন্য ভাড়াটে খুনি নিযুক্ত করেছিল আরুন গাউলি। কিন্তু পুরো সিনেমায় দেখানো হয় অরুন গাউলিকে মিথ্যা দায়ে ফাঁসানো হয়েছে। অনেক অপরাধ করার কারণে তাকে জেলখানায় নিলেও অরুন গাউলি রাজার বেশে জেল থেকে বের হতো এবং তাকে তার দলের লোকেরা রাজার মত মালা পড়িয়ে নিয়ে যেতো। (জায়েদি, ২০১৩)।

(ছবির বাম পাশে বাস্তব জীবনের অরুন গাউলি এবং ডানপাশে অরুন গাউলি চরিত্রের অভিনেতা অর্জুন রামপাল)

সিনেমাটির নির্দেশক অসীম আহলুওয়ালিইয়া, অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, ঐশ্বর্য রাজেশ ও ফারহান আখতার।

সিনেমার শুরুতেই একধরণের এজেন্ডা তৈরি করার প্রচেষ্টা লক্ষনীয়। দেখানো হয় একজন সাংবাদিক তার প্রতিবেদনে বলছেন- *"যেই অন্ধকার গলিতে মানুষ আসতেও ভয় পেতো আজ সেই এলাকায় উন্নতির জোয়ার বইছে, জনতা তাকে বলছে রবিনহুড।"* এছাড়াও দেখানো হয় এলাকার সবার সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় সবাই একবাক্যে অরুন গাউলির সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বক্তব্য দিচ্ছে এবং তার কর্মকাণ্ডের জন্য সকলে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

নিজের সম্পর্কে প্রতিবেদন টেলিভিশনে দেখার সময় অরুন গাউলি তার মেয়েকে প্রশ্ন করে যে রবিনহুড কী? তখন তার মেয়ে খুব গর্বের সাথে বলে যে, *"রবিনহুড হলে তুমি যে কিনা চোর কিন্তু ভিলেইন না, গরীবের সেবা করো তুমি।"* মেয়ের এই কথার মাধ্যমে এমন একটা রিপ্রেজেনটেশন পাওয়া যায় যে সকলে তার এই কর্মকাণ্ড নিয়ে খুবই গর্ববোধ করে কিন্তু অরুন গাউলি যে একজন দাগী আসামী ও ডন এটা আসলে চিন্তা করার কোন বিষয়ই না। একটি দৃশ্যে দেখানো হয় অরুন গাউলির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশ অফিসার তার মায়ের কাছে যায় এবং এই পুরো দৃশ্যটিতে তার মাকে খুবই বিরক্ত দেখা যায়। উনি পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করেন কিছুটা খোঁচা মেরে যে, *"আমার ছেলে কি খুব ভয় হয়! কেনো বারবার পিছনে লাগো আমার ছেলের, আমার ছেলেতো ইচ্ছে করে*

অপরাধ জগতে আসেনি, ওকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে।" মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরেই মায়ের স্থান। পুরো সিনেমার মূল বক্তব্য মায়ের কথার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনের ভেতর গেঁথে দেয়া হচ্ছে যে, অরুন গাউলি আসলে সাধারণ ঘরের ছেলে যে কিনা কোন একটা বিপদে পড়েই আজকের এই গ্যাংস্টার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তবে মায়ের মুখের কথাগুলোতে এটা একবারের জন্যও প্রকাশ পায়নি, তার ছেলে কতটা কুখ্যাত কাজের সাথে জড়িত। এটা অবশ্যই পরিকল্পিত নির্দেশনা।

আরেকটি কথা তার মায়ের বর্ণনায় শোনা যায়, "*আগ না লাগে তো ধুয়া নেহি নিকালতি*" এর অর্থ "*আগুন না জ্বললে তো ধোঁয়া দেখা যেতোনা*" এই কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ঐ সময় মিল গুলো সব বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল রাজনৈতিক কারনে, কিন্তু কেউতো খুজতে আসেনি ঐ মজদুর পরিবারগুলো না খেয়ে কীভাবে জীবন যাপন করছে- আর তাই তার ছেলে বাধ্য হয়েছে এই ধরণের কাজের সাথে যুক্ত হতে। একজন মা যখন তার সন্তানের খারাপ কাজকে সমর্থন করছে, দর্শকরা এখানে মায়ের আবেগের সাথে একমত হয়ে এই পুরো বিষয়টিকে সঠিক হিসেবে মেনে নিবে এটাই মূল কৌশল।

অরুন গাউলির তরুণ বয়সের পাচারকারী ও চুরি করার সহযোগী বন্ধুরা ছিলো তারা সবাই মিলে একটি মদ ও জুয়ার আড্ডাখানায় আক্রমণ চালাতে যায় লুটপাট করার জন্য। মদের আড্ডাখানার মালিক যখন দেখে ফেলে যে এগুলোর সাথে অরুন গাউলিও জড়িত সেখানে নিজেকে বাচানোর জন্য অরুন গাউলি তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলে। দৃশ্যটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেনো অরুন গাউলি কাজটি করতে চায়নি কিন্তু করতে বাধ্য হয়েছে। দৃশ্যটি দেখানোর সময় আবহ সঙ্গীতের মধ্যে একটা ভয়ার্ত ভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একধরণের লাল রঙ এর ব্যবহার এই দৃশ্যে করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটি বিষয়কেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে অরুন গাউলি জেনে বুঝে কাজটি করতে চায়নি কিন্তু করে ফেলেছে এবং বাঁচার জন্য এর পর সে বিভিন্নভাবে এই কর্মকাণ্ডের ফাঁদে পড়ে যায়।

মূলত সিনেমার শুরু থেকেই এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে অরুন গাউলি কখনোই নিজের ইচ্ছায় এই অন্ধকার জগতে আসেনি, ভুলবশত খুন করে ফেলার পর এই সকল ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার বন্ধুরা আরেক কুখ্যাত গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের শরণাপন্ন হয়। তবে সাহায্যের বদলে দাউদ ইব্রাহিম অরুন গাউলি কে দিয়ে আরো বেশি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে ফেলে।

অরুন গাউলি কখনোই দাউদ ইব্রাহিমের মত করে কাজ করতে চায়নি। বরং তার এলাকায় পাচার থেকে শুরু করে সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের লাভের বেশি অংশ কোনোভাবেই দাউদ ইব্রাহিম কে দিতে সে রাজি হতোনা। ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই দাউদ ইব্রাহিমের খুব বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে অরুন গাউলিকে সবাই চেনা শুরু করে। সিনেমায় এই বিষয়টিকে খুব সম্মানের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিনেমায় যেই সময়কাল দেখানো হয়েছে সেই সময় দাউদ ইব্রাহিমের প্রভাব মুম্বাই তথা পুরো ভারতে এত বেশি ছিলো যে গ্যাংস্টার হওয়ার পরেও পুলিশ কখনো তাকে রিমান্ডে নেয়ার চেষ্টা করেনি কিন্তু তার কথায় তারই প্রতিপক্ষদের পুলিশ হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করতো। দাউদ ইব্রাহিমের পিতা ছিলেন একজন কন্সটেবল, সেই ভাবে দাউদ ইব্রাহিমের প্রতি পুলিশের নেক দৃষ্টি ছিলো বলে একটা মন্তব্য অরুন গাউলি করে। অরুন গাউলিকে গুলি করতে যাওয়ার সময় একটি দৃশ্যে দেখানো হয় দাউদ ইব্রাহিম লুকিয়ে গেলো। ফলে এটাই এখানে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় পুলিশ দাউদের কথায় অরুন গাউলিকে ধরতে গিয়েছিলো।

একটি দৃশ্যে দেখা যায় পুলিশ অফিসার নিজে যেচে পড়ে একজন নারী যৌনকর্মীকে চাপ প্রয়োগ করছে যেনো অরুন গাউলির বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আদালতে নাম দেয়। এতে করে অরুন গাউলীকে

ইলেকশনে দাঁড়ানো থেকে আটকানোর চেষ্টার যে বয়ান এখানে দেয়া হয় তা এমন একটা রিপ্রেজেনটেশন তৈরি করে যেনো দর্শকের দেখে মনে হয় অরুন গাউলি একজন সৎ মানুষ যাকে আটকানোর চেষ্টা করছে আইন প্রণয়নকারীরা। কারন তারা ভয় পাচ্ছে আরুন গাউলি জিতে গেলে তাদের গদি হারানোর।

ইদের আনন্দের দিন দাউদ ইব্রাহিম যখন সকল গ্যাংস্টারদের আপ্যায়ন করে একসাথে খেতে বসে সেখানে অরুন গাউলির সাথে সে হাত মিলাতে চায়। কিন্তু অরুন বলে উঠে, "*আমার হাত ময়লা।*" অর্থাৎ সে পদে পদে দাউদ ইব্রাহিমকে অপদস্ত করে এবং তাকে কোনোভাবেই বন্ধু হিসেবে গ্রহন করেনা। পুরো সিনেমায় এটাই বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে, অরুন গাউলি নিজস্ব নীতিতে বিশ্বাসী। বরং দাউদ ইব্রাহিমই তাকে ভয় পেতো।

সিনেমায় দেখানো হয়েছে অরুন গাউলি তার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসে। আর স্ত্রী কখনোই পছন্দ করতোনা অরুন গাউলি এই ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকুক। স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা অরুন গাউলি সিদ্ধান্ত নেয় এই অন্ধকার জগত ছেড়ে অন্য কোন কাজে কাছে হাত দিবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যখন সে তার বন্ধু রামাকে জানাতে যায় ঠিক তখনই রামাকে মেরে ফেলা হয় এবং তাদের গ্যাংয়ের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারো পুরো প্রক্রিয়ার মূখ্য নায়ক হিসেবে আবির্ভাব ঘটে অরুন গাউলির। এই ট্রানজিশন দেখানোর মূলে রয়েছে তাকে হিরো হিসেবে চিত্রায়িত করার এজেন্ডা। অর্থাৎ এমন একটা ভাব এখানে তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যেখানে বুঝানো হচ্ছে অরুন গাউলি সবকিছু ছেড়ে সৎ পথে আসার চেষ্টা করলেও প্রতিশোধ নিতে এবং গ্যাং এর সকলের অনুরোধে তাকে ঢেঁকি গিলতে হয়।

একটি দৃশ্যে দেখানো হয় প্রায় প্রতিদিন অরুন গাউলি ভয়ের মধ্যে পার করে কারণ সে টের পায় তাকে হত্যা করার জন্য দাউদ ইব্রাহিম জেলে একজনকে অপরাধী সাজিয়ে পাঠিয়েছে। এই ভয়ের কথা অরুন গাউলি তার স্ত্রীকেও জানায় এবং পুরো দৃশ্যটায় তাকে খুবই অসহায় লাগে এবং তার জন্য দর্শকের সহমর্মিতা আসতে বাধ্য।

অরুন গাউলি নিজের এলাকার মধ্যে পুরো একটি ট্রেনিং সেন্টার এর মত তৈরি করে ফেলে যেখানে কম বয়সী কিশোরদের গুলি চালানো ও মারামারির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তার বাড়ির ভেতর সে একধরণের সুরঙ্গের মত তৈরি করে ফেলে এবং এই দৃশ্য দেখানোর সময় যুদ্ধক্ষেত্রে জিতে গেলে যেরকম রণসঙ্গীত বাজানো হয় সেরকম একটা আবহ সঙ্গীত যুক্ত করা হয়। এতে করে তার এই পুরো বিষয়টিকে সাহসীকতার অভিযান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

অরুন গাউলি প্রত্যক্ষভাবে যেই কয়জনকে হত্যা করে তার কিছু ঝলক একটি দৃশ্যে দেখানো হয় তাও সেটা হাতে গোনা। কিন্তু এমনভাবে সেই খুন ও অপহরণ কিংবা যেকোন অপরাধকে দেখানো হয় মনে হয় অরুন গাউলি চাপে পড়ে করছে কিংবা প্রতিশোধ নিতে করছে, এমনটা করার তার ইচ্ছা ছিলনা।

জেলখানায় থাকা অবস্থায় অরুন গাউলি তার গ্যাং এর ও এলাকায় সবার কাছে এই বার্তা পাঠায় যেন সবাই মিলেমিশে থাকে কোনোভাবে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যেন তার এলাকায় কোনোধরণের ঝামেলা না হয়।

বিধানসভার নির্বাচনে জিতে গিয়েও অরুন গাউলির মন খারাপ এমন একটা দৃশ্য দেখানো হয়। কারণ এই নেতা হওয়ার পেছনে তার কাছের অনেক লোকের শেষ পরিণতি সে দেখেছে এবং এখনো সবাই তাকে গ্যাংস্টারই ভাবে। নেতা ভাবতে চায়না বিধান সভার অন্যান্য নেতারা। আর তখন তার স্ত্রী তাকে বুঝায় এবং বলে- "*তোমার পাশে সকল জনতা আছে।*" এই কথাটি দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চাওয়া হচ্ছে বিধান সভার নেতারা তাকে নেতা মানুষ কি গ্যাংস্টার ভাবুক তাতে সাধারণ জনতার কিছু যায় আসেনি।বরং তাদের কাছে অরুন গাউলি ছিল ভরসার নাম।

অরুন গাউলি নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম যেদিন অ্যাসেম্বলিতে যুক্ত হতে যান সেখানে অনেকেই তার পাশে বসতে চায়না, উঠে চলে যায়, দৃশ্যটি ধারনের সময় এমন ভাবে আবহ সঙ্গী দেয়া হয়েছে যেন দর্শকের মনে অরুন গাউলির প্রতি একটা সহমর্মিতা তৈরি হয়। এখানে অরুন গাউলি একটি ডায়ালগ বলেন- *"আগার জানতা মুঝকো মাফ কার সাকতি হ্যা তো আপলোগ কিউ নেহি"*- অর্থাৎ *"যদি সাধারন জনতা আমাকে মাফ করে দিতে পারে আমার অতীতের জন্য তাহলে আপনারা কেনো পারছেন না"* জনপ্রিয় নেতা হয়ে সাধারণ মানুষের জন্য জীবন দিয়ে কাজ করেও অরুন গাউলির জীবন থেকে তার অতীতের দাগ মুছেনি। এর কারণ হতে পারে দাউদ ইব্রাহিমের সাথে তার শত্রুতা, যার কারনে বছর পার হয়ে গেলেও দাউদের অরুনের প্রতি ক্ষোভ কমেনি এবং নানাভাবে নানা মানুষের মাধ্যমে এমনকি পুলিশি সহযোগীতায় অরুনকে দাউদ ইব্রাহিমের লোকেরা মিলে একটি মিথ্যা মামলায়, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে ফাঁসিয়ে দেয়। আর পুরো সিনেমা জুড়ে গাউলির প্রতি এক ধরণের মমত্ববোধ তৈরি হবে দর্শকদের।

অরুন গাউলিকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন অনেক জনতার ভীড় দেখানো হয়েছে এবং আবেগপূর্ন আবহ সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আইন-আদালত সবাইকেই শত্রুরূপে দেখানো হয়েছে। একজন কুখ্যাত গ্যাংস্টার নেতা হয়ে গেলেই যে তার অপরাধ মাফ করে দিতে হবে এমনটা কোনোভাবেই সম্ভব না। কিন্তু এই সিনেমায় এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে যেখানে মনে হচ্ছিলো গাউলি একজন অসামান্য মহাপুরুষ যার বিরুদ্ধে আইন, আদালত, নেতারা সবাই উঠে পরে লেগেছিলো। কিন্তু তার করা অপরাধ কখনোই ক্ষমা করা সম্ভব না। কিন্তু সিনেমায় তাকে বারবার নিপীড়িত দেখানো হয়েছে যা একেবারেই বাস্তবতার সাথে মিলে না।

পুরো সিনেমাটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা দেখার পর মনে হবে অরুন গাউলির সাথে পুলিশের খারাপ সম্পর্কের জন্যেই তাকে নিয়ে এত সমস্যা। আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ দর্শকের মনে হবে অরুন গাউলি একজন জননেতা যাকে পুলিশ এবং দাউদ ইব্রাহিমের লোকেরা মিলে বারবার ফাঁসাচ্ছে। সফল নেতা হয়েও কোনোভাবে এই কেস থেকেনরুন গাউলি কোনভাবে বেঁচে ফিরতে পাওে না। যখন খারাপ করেছে তখন সহজেই বেরিয়ে আসতে পারতো কিন্তু যখন জনতার জন্য কাজ করা শুরু করেছে সবাই মিলে অরুন গাউলির বিরুদ্ধে চলে গেছে এমনটাই এই সিনেমার শেষে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, একজন গ্যাংস্টার চাইলেই কি তার সকল অতীত ফেলে দিতে পারে কিনা, এত অন্যায় অবিচার দেখানোর আঙ্গিকটা এই সিনেমায় ছিলো অন্যরকম, অরুন গাউলিকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিলো এই সিনেমার মূল লক্ষ্য। সুতরাং সর্বোপরি বলা যায় পুরো সিনেমাটিতেই অরুন গাউলির প্রতি দর্শকদের যেন সহমর্মিতা তৈরি হয় এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

হাসিনা পার্কার

পুরো সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ভারতের মুম্বাই শহরের গডমাদার হাসিনা পার্কারকে কেন্দ্র করে। বিশ্বজুড়ে নানা ধরণের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড চলছে। মাফিয়া চক্রগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু। আর এই মাফিয়াদের অনেক নামে ডাকে সাধারণ মানুষ। গডফাদার বলেই তাদের আমরা জানি। ভারতেও তাই। অপরাধীদের একটা আলাদা সাম্রাজ্য থাকে। সেই অন্ধকার সাম্রাজ্যের এক গডমাদার হলেন হাসিনা পার্কার। আপা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন এই গ্যাংস্টার। তার নাম মুখস্ত না থাকলেও চলে সবাই চিনতো তাকে আপা নামে। আপা শব্দটাতেই একটা ভয়ের অনুভূতি দিতো সেই সময়ের সবাইকে। তবে তাকে সবাই চিনে কুখ্যাত গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহীমের বোন হিসেবেই। হাসিনা বয়সে দাউদের ছোট ছিলেন। বড় দুইভাই শাবির ও দাউদ মিলে ভয়ের রাজত্ব তৈরি করে ফেলেছিলো অল্প সময়েই। আর ধীরে ধীরে তারা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল আন্ডারওয়ার্ল্ড। তবে এই অন্ধকারের রাজত্বে বোনদের টানতোনা ভাইয়েরা। চার বোনের সকলেই বিয়ে করে সংসারী। হাসিনারও সুন্দর পরিবার

ছিলো, ভরা সংসার ছিলো। কিন্তু ভাইয়ের পরিচয় তার পিছু ছাড়েনি এবং কালের বিবর্তনে নাগপাড়া তথা মুম্বাইয়ের এক ছোট এলাকা থেকে অন্ধকার রাজত্যের রানী হয়ে ওঠা দেখানো হয়েছে হাসিনা পার্কার সিনেমায়। সিনেমাটি নির্মাণ করেন অপূর্ব লাখিয়া ও অভিনয় করেন শ্রদ্ধা কাপুর, সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।

চলচ্চিত্রে দেখানো হয় মূলত স্বামীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরপরই হাসিনা পার্কার অপরাধজগতের সাথে লিপ্ত হন। তার সাথে যুক্ত হয় কুখ্যাত বাকি সব গ্যাংস্টাররা। ভাই দাউদ ইব্রাহিমের মুম্বাইয়ের সকল কাজের দেখভাল করতেন হাসিনা। সিনেমায় বারবার দেখানো হয়েছে হাসিনার সাথে দাউদের কাজ সংক্রান্ত কোনো কথা হয়না যা নিতান্তই দূর্বল উদাহরণ। দাউদ ইব্রাহিমের মুম্বাইয়ের সকল ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল হাসিনা পার্কারের হাতে। তার নামে প্রায় ৫০০০ কোটি রুপির অর্থসম্পদ রয়েছে। হাসিনা পার্কারের নামে ৮৮ টি মামলা থাকা স্বত্ত্বেও কোর্টে হাজিরা দিয়েছিলেন মাত্র একবার। তার নামে ছিলো একাধিক চাঁদাবাজির মামলা, তিনি চালাতেন অর্থসংক্রান্ত মধ্যস্বত্তাভোগী দল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারত কিংবা ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য সবদিক থেকেই কালো টাকার লেনদেনে সিদ্ধহস্থ ছিলেন এই নারী। ভূমি দখলের যেকোন কাজেই সবাই তার কাছে যেত। তার অনুমতি ছাড়া কোন ভূমি বেচাকেনা সম্ভব ছিলোনা। জমি সংক্রান্ত মামলা, বিল্ডার নিয়ে মারামারি, অর্থপাচার সবকিছুর সাথেই তিনি জড়িত ছিলেন। এরপর হাসিনা পার্কার হাত দেন অর্থলগ্নি করায়। ডন মাফিয়াদের কালো টাকাকে বলিউডের সিনেমার জগতে ঢালা শুরু করেন তিনি। যার কোন অংশই সিনেমায় দেখানো হয়নি। দাউদ ইব্রাহিমের ও হাসিনা পার্কারের পিতা ছিলেন একজন কনস্টেবল পরিবার ছিলো অনেক বড়, ফলে ছোট থেকেই অভাব অনটন লেগে থাকতো সংসারে। কিন্তু পিতা তার সন্তানদের ছোট থেকেই স্কুলে পাঠাতেন, চাইতেন তার সন্তানরা ভালো মানুষ হোক। (জায়েদি, ২০১২)।

(বাম পাশের ছবিতে হাসিনা পার্কারের চরিত্রে অভিনয় করা শ্রদ্ধা কাপুর এবং ডান পাশে বাস্তব জীবনের হাসিনা পার্কার)

সিনেমার শুরুতেই আদালতের দৃশ্যে দেখানো হয় আইনজীবী হাসিনা পার্কারের পিতাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলা শুরু করে। নিজের বাবার সম্পর্কে এই ধরণের কথা শুনে হাসিনা পার্কার যেন রেগে যায় সেই চেষ্টা আইনজীবী করছিলো। আর এটার মাধ্যমে দর্শকদের মনে শুরু থেকেই হাসিনা পার্কারের প্রতি এক ধরণের সহমর্মিতার জায়গা তৈরি হয়ে যায় ও আইনজীবির অভিনয় এমনভাবেই

ফুটিয়ে তোলা হয় যেন দর্শকের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আইনজীবীর কথার ধরণ ও চাল-চলন গুলোও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কথার ভঙ্গি অত্যন্ত অশোভনীয় ও আচরণে উন্নাসিকতা পাওয়া যায়। যা ইচ্ছে করে দেখানো হয়েছে যেনো দর্শক হাসিনা পার্কারকে নিরীহ মনে হয়।

একটি দৃশ্যে দেখানো হয় হাসিনা পার্কারের ভাই দাউদ ইব্রাহিম তখনো ছোটখাটো চুরি-ডাকাতির সাথে জড়িত, এগুলো করে সে তার ছোট বোন হাসিনার জন্য ঘড়ি নিয়ে আসে। সব জানা স্বত্ত্বেও তার বোন সেটা হাসিমুখে গ্রহণ করে এবং ভাইকে অত্যন্ত সম্মান করে। একজন বোন হিসেবে হাসিনা চাইলে পারতো তার ভাইকে আটকাতে, কিংবা তাকে বোঝাতে এই কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসতে কিন্তু সে তা কখনই বলেনি। বরং এখানে তার উপস্থাপন ছিলো আদুরে ছোট বোনের যে তার ভাইয়ের সবকিছুই ভালবাসে, এমনকি খারাপটাও।

একটি দৃশ্যে দেখানো হয় অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য তাদের পিতা দাউদ ইব্রাহিমকে শাস্তি দেয়ার জন্য নিজের প্যান্টের বেল্ট খুলে যখন পেটানো শুরু করে সেখানেও হাসিনা একা গিয়ে তার পিতাকে আটকায়। কিন্তু সেইসময় তার মাথায় কাপড় খুলে যায়, আর তখন তার পিতা তাকে কর্কশ ভাবে বলে উঠে- "*নিজের সীমার মধ্যে থাকো মেয়ে, মাথায় কাপড় দাও নাহলে চামড়া তুলে নিব।*" এর মাধ্যমে এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয় হাসিনার নিজস্ব কোনো মতামত কখনই প্রাধান্য পায়নি বরং ছোট থেকে পিতা ও ভাইদের কথামতো জীবন তাকে বেছে নিতে হয়েছে। সেই জীবনে ছিলনা কোন আনন্দ কিংবা নিজের মতো চলার স্বাধীনতা।

সিনেমার শুরু থেকেই হাসিনা পার্কার কে দেখানো হয় একজন সরল মেয়ে হিসেবে যে খুব ভয়ে ভয়ে চলতো। সে কোনোদিন তার স্বামীর কথার অবাধ্য হয়নি। তার স্বামীর জন্য সে সবকিছু করতে রাজি ছিলো। সিনেমায় এই অংশটুকু খুব বেশি সময় নিয়ে দেখানো হয়েছে এর কারণ দর্শকের মনে এমন একটা বার্তা পৌঁছানো যে হাসিনা পার্কার আর দশজন নারীর মতোই একজন নারী যে তার স্বামী সংসার নিয়ে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো। ইচ্ছে করে এই টাইমলাইনটাকে টেনে বড় করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় নাচ-গানের ও রোমান্টিক দৃশ্যের ব্যবহার করা হয়েছে যেনো মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে দর্শকের চিন্তা শুধুমাত্র হাসিনা পার্কারের নারীসুলভ সরলতায় আটকে থাকে।

সিনেমার বেশ কিছু জায়গায় হাসিনা পার্কারকে নামাজ আদায় করতে দেখানো হয়, এইধরণের দৃশ্য অবতরণ করার কারণ সাধারণ মানুষের মনে এটা প্রবেশ করিয়ে দেয়া যে হাসিনা পার্কার একজন ধর্মভীরু, ধর্মপরায়ন নারী। যুগে যুগে ধর্মকে ব্যবহার করেছে মানুষ রাজনীতি করার জন্য। এই সিনেমাতেও এইধরণের দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা এজন্যই যেনো হাসিনা পার্কারকে ইতিবাচক জায়গায় অবস্থান দেয়া হয়।

সিনেমায় শুরু থেকেই দেখানো হয় হাসিনা খুবই অল্পভাষী একটি মেয়ে যে বেশি কথাও বলে না। কিন্তু একটি দৃশ্যে দেখানো হয় তার সামনে মহল্লার অন্যান্য নারীদের পানি নিতে দেয় না মহল্লারই আরেক মারমুখো এক নারী। কিন্তু হাসিনা এই অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনা এবং সেই নারীকে মেরে ধমকে তাড়িয়ে দেয়। আর এরপর থেকে মহল্লার সকল নারীর কাছে সে হয়ে ওঠে ভরসার জায়গা।

নম্র স্বভাবের হাসিনার মধ্যে সুপ্ত রাগ আছে তা বারবারই সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার কাছের কেউ বিপদে পড়লে তার সেই রূপ ফুটে উঠে, দেখানো হয় তার স্বামীর হোটেলে এক লোক প্রায়ই খেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যায়। টাকা চাওয়াতে সেই লোক মারার হুমকি দেয় এবং হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় বিষয়টি। ক্যাশিয়ারের কোলে হাসিনা পার্কারের ছোট মেয়ে বসা থাকে এবং সে এগুলো দেখে ভয় পেয়ে যায়। আর তাই হাসিনা তখন সেই টাকা না দেয়া লোকটিকে মারধোর করে। এখানে ক্লোজ শট নেয়া হয় এবং আবহ সঙ্গীত এমনভাবে দেয়া হয় যেনো মনে হয়

সেইরকম একটা কাজ করে ফেলেছে হাসিনা পার্কার। এই দৃশ্যে হাসিনা পার্কারকে অত্যন্ত তেজস্বিনী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে হাসিনা পার্কার নিজের জন্য কখনোই উঁচু গলায় কথা বলেনি কিন্তু তার আপনজনদের ক্ষতি করতে আসলে সে কখনো চুপ করে থাকেনি।

দাউদ ইব্রাহিমের শত্রুতার জের ধরে হাসিনা পার্কারের স্বামীকে হত্যা করে অরুন গাউলির দলের সদস্যরা। এর পেছনে কারণ ছিলো দাউদ ইব্রাহিমের দলের লোকেরা মিলে উৎসবের দিন অরুন গাউলির ছোট ভাইকে হত্যা করে। মূলত এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে যেনো দর্শকের মনে দাগ কাটে যে এই নারীর নিজের কারো সাথে শত্রুতা ছিলোনা কিন্তু ভাইয়ের অপরাধের জের ধরে তার নিরীহ স্বামীকে যখন খুন করা হয় তখন সে একবারেই দিশেহারা হয়ে যায়। হাসিনা পার্কারের স্বামী তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে তার স্ত্রীর কোলে এমনটাই দেখানো হয়েছে সিনেমায়। দৃশ্যটি অত্যন্ত আবেগঘন এবং এমনভাবে চিত্রায়িত হয়েছে যে হাসিনা পার্কারের অসহায়ত্ব দর্শকের কাছে ফুটে ওঠে।দর্শকের মনে হাসিনা পার্কারের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হবে এই দৃশ্যের মাধ্যমে।

হাসিনা পার্কারের সাথে দাউদ ইব্রাহিমের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে তা সিনেমায় স্বাভাবিকভাবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি দৃশ্যে হাসিনাকে তার ভাই বলে, *ভরসা রাখো বেটা আর দোয়া করো*, এর প্রতিউত্তরে হাসিনা বলে, *দোয়াইতো করছি ভাই*। এই কথার মানে দাউদ ইব্রাহিম হয়তো অন্য কিছুই ধরে নেয় এবং হাসিনাকেও কিছুটা চিন্তিত দেখা যায় যেনো সে তার ভাইয়ের সাংকেতিক কথাগুলো বুঝে উঠতে পারে না। এর পরপরই দাউদ ইব্রাহিমের লোকেরা হাসিনা পার্কারের স্বামী হত্যাই জড়িত দুই অপরাধীর একজনকে হত্যা করে ফেলে। এখন এখানে হাসিনা পার্কারের সম্মতিতেই এমনটা হয়েছে তা কিন্তু খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়নি কিংবা কোথাও এটা প্রকাশ্যেও বলা হয়নি। যেহেতু এই সিনেমায় হাসিনা পার্কারকে প্রোটাগনিস্ট হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে,তাই এভাবেই কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঘটনাগুলো দেখানো হয়েছে। সরাসরি হাসিনা পার্কারকে কোথায় দোষী হিসেবে তুলে ধরা হয়নি।

সিনেমায় বারবার এই জিনিসটির প্রতি দৃষ্টিপাত করানো হয়েছে যে হাসিনা পার্কার ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। আইনজীবী যখন তাকে প্রশ্ন করে যে দাউদ ইব্রাহীমের ২০০০০ কোটি টাকার অপরাধমূলক ব্যবসার দায়িত্ব তার বোন হিসেবে ও একমাত্র আত্মীয় হিসেবে হাসিনা পার্কারই সামলাচ্ছে তখন হাসিনা বলে উঠে, যে নিজেই ২০০ টাকার বৈদ্যুতিক বিলের কাগজ বুঝতে পারে না সে কীভাবে এগুলো বুঝবে। খুব সহজেই দর্শকদের মননে এই চিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় এই সংলাপের মাধ্যমে যে এই অসহায়, কম লেখাপড়া জানা নারীর পক্ষে আসলেই কি এগুলো করা সম্ভব কিনা।

একজন মা হিসেবে এবং একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর হাসিনা পার্কার একজন যোদ্ধার মত করে নিজের সন্তানদের জন্য আয় রোজগার করা শুরু করে, তার স্বামীর হোটেলের কাজ নিজে দেখভাল করা শুরু করে। একজন সাহসী নারী হিসেবে তাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

এই সিনেমায় দেখানো হয় দাউদ ইব্রাহিম তার পরিবারের সবাইকেই তার কাছে দুবাইতে নিয়ে নিতে পারে শুধু হাসিনা পার্কারকে ছাড়া। ফোনে ভাইয়ের সাথে আলাপের দৃশ্যে হাসিনা বলেন- "*আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর তার পরিবারের দায়িত্ব আমার*" এর দ্বারা তাকে একজন দায়িত্বশীল আদর্শ স্ত্রী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আসলেই কি শুধু এই একটি কারণে হাসিনা পার্কার মুম্বাই ত্যাগ করেননি, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোটি কোটি টাকার অবৈধ ব্যবসা এর উত্তর এই সিনেমায় পাওয়া যায়না।

একটি দৃশ্যে দেখানো হয় হাসিনা পার্কারের বাড়ির সামনে স্যান্ডেল আর মানুষের ভীড়। তার হাতে মানুষ এসে চুমু খাচ্ছে এবং তার কোলে ছোট বাচ্চা। মানুষের ভীড় আসলে যেই জন্য তার

সঠিক ব্যাখ্যা থেকে সরে আসার সুবিধার্থে দেখানো হয়েছে হাসিনা পার্কার শিশুদের কোলে তুলে আদর করছে।

হাসিনা পার্কারের অপরাধ জগতের সাথে সংযোগ কৌশলে এড়িয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে রঙ ঢং মেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছেলে দানিশের মরে যাওয়ার দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে মা হিসেবে তার কষ্টের জায়গা তুলে ধরা হয়েছে দর্শকের কাছে কিন্তু এমন কত মায়ের ছেলেদের নানাভাবে হেনস্থা করেছেন তিনি তার কোন উপস্থাপন নেই পুরো সিনেমায়।

পুরো সিনেমাটি বিশ্লেষণের পর এটাই স্পষ্ট হয় যে মানুষের মনের মধ্যে হাসিনা পার্কারের বিভীষিকার স্মৃতি সরিয়ে নতুন এক পরিষ্কার ইমেজের হাসিনা পার্কারকে চিত্রায়িত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার গভীর বিশ্লেষণধর্মী বই লিখলেও সরাসরি হুসেইন জায়েদি নিজেও হাসিনা পার্কারকে মাফিয়া হিসেবে বলতে চাননি, তার বই মাফিয়া কুইন্স অফ মুম্বাইতেও তিনি বাকি সবার কথা উল্লেখ করলেও হাসিনা পার্কারের কথা উল্লেখ করেননি। সমসাময়িক অনেক গ্যাংস্টারদের স্ত্রীদের কথাও তুলে ধরেছেন সাংঘাতিক হিসেবে কিন্তু হাসিনা পার্কারের নাম কোথাও আসেনি। (জায়দি, ২০১১)।

তিনটি সিনেমায় অনুসৃত কৌশল বিশ্লেষণ

তিনটি সিনেমা ২০১৭ সালে মুক্তি পেয়েছে যার মধ্যে বিতর্কিত চরিত্রের পুনর্বিন্যাস দেখা যায়। একই ধরণের নির্মাণ ও প্রচারণার কৌশল ও লক্ষ্য করা যায়। অপরাধীদের রবিনহুড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান ও রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে দেখানো হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতির কারনে গ্যাংস্টার হতে বাধ্য হয়েছে এমনটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে সঠিক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশকে নেতিবাচকভাবে ও হেয় করে দেখানো হয়েছে। গ্যাংস্টারদের নারীর প্রতি সহমর্মিতামূলক আচরণ বারবার তুলে ধরা হয়েছে,তাদের ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত দাউদ ইব্রাহিমকে নেতিবাচক দেখাতে গিয়ে অন্য অপরাধীদের নায়োকচিত উপস্থাপনকে গ্রহনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জনপ্রিয় এবং ব্যক্তিজীবনে সৎ ও বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থান করছে এমন অভিনেতাদের নেয়া হয়েছে যেন বার্তা বেশি বেশি দর্শকের কাছে ইতিবাচকভাবে পৌঁছায়। গ্যাংস্টারদের একটি পরিচ্ছন্ন চরিত্র রূপায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোতে গ্যাংস্টার চরিত্রগুলোর মহিমান্বিত রূপায়নের লক্ষ্যে একধরণের ইতিবাচকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তিনটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই রূপরেখা একই রকম। যোগাযোগবিদ কার্ট ল্যাং ও এঞ্জেল ল্যাংয়ের মতে, "গণমাধ্যম জনগণকে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। গণমাধ্যম এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় জনগণের কাছে উপস্থাপন করে, যা নিয়ে তাদে চিন্তা করতে হয়, জানতে হয়, অনুধাবন করতে হয়।"(Lang and Lang, 1981)।

সমসাময়িক সময়ে রিলিজ পাওয়া তিনটি চলচ্চিত্রেই কিছু একই রকম বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়।

অপরাধীদের জনদরদী হিসেবে উপস্থাপন তিনটি চলচ্চিত্রে একইরকম। রইস সিনেমায় দেখা যায়, রইস নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকলেও তার এলাকার এবং গুজরাটের অনেক মানুষের জন্য সে সমাজসেবা মূলক কাজ করে। মহিলাদের কর্মসংস্থানের যোগান দেয়, সেলাই মেশিন কিনে দেয়। প্রয়োজনে গরীব মানুষের হয়ে লড়াই করে। একইরকমভাবে ড্যাডি সিনেমাতেও দেখা যায় শুরুর দৃশ্য থেকেই ড্যাডি তথা অরুন গাউলি তার এলাকার মানুষদের জন্য দরদের সাথে কাজ করে এবং তার প্রতি জনগণের ভরসার জায়গাটাও চলচ্চিত্রের শুরুতেই সাংবাদিকের নেয়া সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। একইরকমভাবে হাসিনা পার্কার চলচ্চিত্রে দেখা যায় সবাই তার কাছে নানা ধরণের আর্জি নিয়ে আসে। তার বাসার সামনে সারাদিন ভীড় লেগে

থাকতো। একটি দৃশ্যে দেখা যায় হাসিনা পার্কারের মেয়ে একজন বুড়ি মায়ের জন্য আর্জি নিয়ে আসে যেনো তার বাসা ছাড়তে না হয়। হাসিনা পার্কার সেই বয়স্ক ভদ্রমহিলার জন্য ঐ বাড়ি যারা দখল করে নিতে চাইছিলো তাদের ভয় প্রদর্শন তথা কাজ হাসিল করে ফেলে।

তিনজন গ্যাংস্টারকেই দেখানো হয়েছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তারা অবস্থান করছে এবং নানাভাবে তাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার কারণে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। রইস সিনেমায় দেখানো হয় যখন রইস একদম কঠিন বিপদে পড়ে যায় ও সকল নেতা তার সাথে বেইমানী করে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তখন রইস সিদ্ধান্ত নেয় সে নিজেই ইলেকশনে এমপি পদে দাঁড়াবে এবং সেখানে তার স্ত্রী একটি সংলাপে বলে- "*রইস সবার জন্য অনেক করেছে, ইলেকশন রইসই জিতবে*।" এই কথার মধ্য দিয়ে এটাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে অপরাধী হিসেবেও জনগণ তাকে ভালবাসে।

ড্যাডি সিনেমাতেও দেখা যায় জেলে থাকা অবস্থাতেও তার প্রতি জনগণের আস্থা ও ভক্তি যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। দাউদ ইব্রাহিমের বিপরীতে অবস্থানের জন্যই হয়তো তার প্রতি তৎকালীন মুম্বাইয়ের জনগণের একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিলো। ফলে তার প্রতি সবার একটা আশা ছিলো নেতা হিসেবে অরুন গাউলি তার লোকজনের কথা চিন্তা করবে। ফলে জেল থেকে বের হয়েই অরুন গাউলি বিধানসভার ইলেকশনে দাঁড়ায় এবং জিতে যায়। রাজনীতির মাঠে তাকে হারানো ছিলো কঠিন এমনটাই দেখানো হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। হাসিনা পার্কার চলচ্চিত্রেও দেখা যায় হাসিনা পার্কার তার এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে যায় যখন এলাকাবাসীর হয়ে কথা বলা শুরু করে। এছাড়াও তার সম্মতি ছাড়া কোনো ধরণের জমি বেচাকেনা মুম্বাইতে করা সম্ভব ছিলনা। পুলিশ থেকে শুরু করে রাজনীতিবীদরা পর্যন্ত তার কাছে নিয়মিত আসা যাওয়া করতো। সাহায্য নিতো। তিনটি সিনেমাতেই এমন ভাবে এই তিনজন গ্যাংস্টারকে রূপায়িত করা হয়েছে যেনো মনে হয় তারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ক্ষমতাধর। সম্পূর্ণ বিষয়টিই ক্ষমতার খেলা।আর তাদের ক্ষমতার কথা সকলে জানে জন্যই তাদের সমীহ করে চলে। ফুকো বলেন- "ক্ষমতা শেকল আকারে কাজ করেনা- এটা ছড়িয়ে পড়ে" (হল, ২০১৫)।

তিনটি চলচ্চিত্রে অপরাধ রাজ্যে আসাটা তিনজনের ক্ষেত্রেই এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেনো বাধ্য হয়ে তারা এই জীবন বেছে নিয়েছে। কিন্তু এমন অনেক সুযোগ ছিলো যেখানে তারা তাদের সকল কর্মকাণ্ড থেকে সরে এসে সাধারণ জীবন যাপন করতে পারতেন কিন্তু ক্ষমতার লোভের কথা এই তিনটি সিনেমার একটিতেও দেখানো হয়নি বরং তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতার রূপ দান করতে তাদের নানারকম ইতিবাচক দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে তিনটি চলচ্চিত্রেই। তিনটি চলচ্চিত্রেই এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে অপরাধীই হলো ভিক্টিম। আর পুলিশ নিজস্ব শত্রুতার জের ধরে ও প্রতিযোগিতার কারণে তাদের প্রতিবার ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করেছে। রইস চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে পুলিশকে অপমান করায় অপমানের প্রতিশোধ নিতে জনদরদী রইসের পেছনে পুলিশ অফিসার লেগেই থাকে। ড্যাডি-তে দেখানো হয় সকল অপরাধ শেষে অরুন গাউলি যখন একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নতুন জীবন শুরু করে তখনো পূর্বের শত্রুতার জের ধরে পুলিশ অফিসার তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে এবং একসময় তাকে ফাঁসিয়ে জেলে পুরতে সক্ষম হয়।হাসিনা পার্কার সিনেমায় দেখানো হয়, আইনজীবী ও পুলিশ নিজেদের মতো করে মনগড়া মকদ্দমায় তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে।

নারীর প্রতি সহমর্মীতামূলক আচরণের ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়। রইস চলচ্চিত্রে দেখা যায় রইস তার স্ত্রীকে অনেক ভালবাসে এবং স্ত্রীর অনেক সেবা-যত্ন করে। স্ত্রীর প্রতি তার আবেগ দর্শককে তার জন্য একধরণের ইতিবাচকতা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এই ধরণের আচরণ দ্বারা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় ব্যক্তিগত জীবনে রইস একজন আদর্শ স্বামী। ড্যাডি-তে অরুন গাউলির প্রতি দর্শকদের মায়া তৈরি হবে যখন তার স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসার নিদর্শন তারা দেখবে।

কারণ অরুন গাউলিকে অপরাধী দেখানোর পরপই তাকে একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে দেখানো হয়েছে, যে বন্দুক এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে মেয়েকে সামলায় আবার স্ত্রীর বকাঝকা খেয়েও তাকে কোনদিন একটা উচু গলায় কথা পর্যন্ত বলে না। আবার তার বন্ধু রামাকে মেরে ফেলার পেছনে তারই প্রেমিকা আছে জানার পরেও অরুন গাউলি তাকে না মেওে জীবন ভিক্ষা দেয় আর এর মাধ্যমে সে এলাকা এবং গ্যাং এর সবার কাছে সম্মানের পাত্র হয়ে যায়। হাসিনা পার্কার সিনেমায় দেখানো হয় হাসিনা পার্কার একজন অসহায় নারীর পাশে দাঁড়ায় কারন তার বাসা ছেড়ে যাওয়ার মত কোন অবস্থা থাকেনা আবার তার বিরুদ্ধে কথা বলা নারী আইনজীবীর সাথেও সে হেসে কথা বলে তার মায়ের খোঁজ খবর জানতে চায়, এর দ্বারা এটাই প্রমান করার চেষ্টা করা হয় ব্যক্তিগত জীবনে সে অত্যন্ত বিনয়ী ও নারীদের অধিকারের প্রতি সোচ্চার।

ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। রইস কে দেখানো হয় মাজাওে চাদর চড়াচ্ছে, অরুন গাউলিকে দেখানো হয় নিয়মিত পুজা অর্চনা করছে আবার হাসিনা পার্কারকেও বারবার দেখানো হয় নামাজরত অবস্থায়। ধর্মকে পুঁজি করে এই গ্যাংস্টারদের মহিমান্বিত করে দেখানোর প্রচেষ্টা তিনটি চলচ্চিত্রেই একইরকম।

দাউদ ইব্রাহীমকে প্রতিপক্ষ দেখানোর জন্যই অন্যান্য অপরাধীদের নায়োকচিত উপস্থাপন করা হয়েছে তিনটি চলচ্চিত্রেই। মূলত দাউদ ইব্রাহিমকে তিনটি সিনেমাতেই প্রতক্ষ্য এবং পরোক্ষ দুইভাবেই নেতিবাচকভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই খলনায়ককে নেতিবাচক দেখাতে গিয়ে আরেক প্রতিপক্ষ তৈরি করা হয়েছে যাদের দেখে নায়কের মত মনে হয়। বরং দাউদ ইব্রাহিমের বিপরীতে অবস্থান করার জন্য তাদের এক পাক্ষিকভাবে ইতিবাচকভাবে বারবার ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। ভারতের মুম্বাইয়ের দাউদ ইব্রাহিম যা যা অপরাধ করেছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তার মানে এটা না যে তার প্রতিপক্ষ যারা ছিলো কিংবা তার আশেপাশেও যারা ছিল তারা সবাই সৎ ও সঠিক। ভিলেইন কে নেতিবাচক দেখাতে গিয়ে এখানে যাদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তারা কেউই আসলে নায়ক নন। বরং তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই সঠিক হিসেবে মহিমান্বিত করার সুযোগ নেই।

এজেন্ডা সেটিং তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানি আলোচ্য সূচি নির্ধারণে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো চলচ্চিত্র। আর এই চলচ্চিত্রে যখন একই বছরে তিনটি একই ধরণের চলচ্চিত্রে মুক্তি পাচ্ছে এবং তিনটিরই মূল বিষয় একই ধরণের, তখন এটি অবশ্যই জনমনে বিশেষ জায়গা করে নিতে সক্ষম। গণমাধ্যম আমাদেও জন্য আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে দেয় নানান কৌশলে। আলোচ্য সূচি নির্ধারণের কিছু ধাপ আছে।

প্রথম ধাপ হলো দ্বার রক্ষণ বা গেট কিপিং-এই তত্ত্ব অনুযায়ী গণমাধ্যম থেকে আমরা কখনোই অপরিশোধিত তথ্য পাই না। অনেকভাবে পরিশোধিত হয়ে তথ্য আমাদের কাছে পৌছায়। তিনটি সিনেমাই একদম সরাসরি আসল অনুসন্ধান বা গবেষণার মাধ্যমে আমাদের কাছে আসেনি। বিনোদনের মাধ্যম হলো সিনেমা। তাই এতে আরো নানা উপাদান যুক্ত হয়ে গিয়েছে ফলে তিনটি সিনেমাই যে একদম সঠিক তথ্য সম্বলিত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে তা নয়। গবেষণা লব্ধ ফলাফল তাই প্রমাণ করছে। দ্বিতীয় ধাপ হলো মুখ্যকরণ-তিনটি সিনেমারই মূখ্যকরণের জায়গা ছিলো তিনজন চিহ্নিত গ্যাংস্টারকে আলোচনায় নিয়ে আসা। এই তিনজন সম্পর্কে হয়তো অনেক মানুষই জানত না। তাদের মূল গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচীতে স্থান দেয়ার জন্যেই ২০১৭ সালে পরপর তিনটি সিনেমা মুক্তি দেয়া হয় এবং এই বিষয় নিয়ে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সবাই কথা বলা শুরু করে। তৃতীয় ধাপ হলো- কাঠামোকরণ-একেকটি ঘটনার একেকধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। একেকটি ঘটনাকে একেকভাবে গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। যখন কোনো তথ্যকে কোনো বিশেষ আঙ্গিকে ও বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে প্রচার করা হয় তখন তাকে ফ্রেমিং বলে।

তিনটি সিনেমার ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়, তিন জন গ্যাংস্টারকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে।ফলে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নয় বরং তাদের জীবনের কিছু বিশেষ অংশকে চমকদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তাদের জন্য দর্শকদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়ে ইতিবাচক চিন্তা ও তাদেও মহিমান্বিত ভাবার নতুন ধারা তৈরি হয়।

আবার প্রচারণা তত্ত্বের মাধ্যমে যেভাবে দর্শকদের বিভ্রান্ত করা হয় তার উপাদানও পাওয়া যায় এই তিনটি সিনেমায়। বিভিন্ন তাত্ত্বিকের লেখায় তিন ধরণের প্রচারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। (Becker, 1949; Snowball, 1999)।

কালো প্রচারণা: যা একেবারে মিথ্যা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

সাদা প্রচারণা: কাউকে প্রতারিত কওে না তবে জনগণের মনযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিতে এই প্রচারণার সহায়তা নেয়া হয়।

ধূসর প্রচারণা: এই প্রচারণার অবস্থান সাদা ও কালো প্রচারণার মাঝামাঝি। এ ধরণের প্রচারণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ, দর্শক থাকে একেবারেই অজ্ঞ। তথ্যের সত্য মিথ্যা সহজে ধরা পড়েনা। মূলত প্রতিপক্ষের বিশ্বাস বিপরীত দিকে প্রবাহিত করার জন্য এই ধরণের প্রচারণা করা হয়েছে।

এই তিনটি সিনেমার ক্ষেত্রে বলা যায় ধূসর প্রচারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা মিশিয়ে সাধারন জনগণকে বোকা বানানোর প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রচারণার বেশ কিছু কৌশল আছে যার সাথে এই তিনটি সিনেমার অনেক কিছুই মিলে যায়। কৌশল গুলো হলো-বদনাম দেয়া,মনোগ্রাহী সাধারণ উক্তির ব্যবহার,স্থানান্তর, সাধারণের কাতারে দাঁড় করানো, তাস ভাঁজ করা কৌশল ইত্যাদি। রাইস, ড্যাডি এবং হাসিনা পার্কার এই তিনটি সিনেমাতেই দেখা যায় একচ্ছত্রভাবে পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সকলকে একধরণের বদনাম দেয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।তিনটি সিনেমাতেই নানাসময় কিছু ডায়ালগের ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে মনোগ্রাহী উক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- রইস সিনেমায় একটি ডায়ালগ কে কেন্দ্র করেই দেখানো হয় রইস তার অপরাধমূলক কাজকে জাস্টিফাই করে। *"ধান্দে সে বাড়া কোই ধার্ম নেহি হোতা"* অর্থাৎ ব্যবসায়ের চাইতে বড় ধর্ম আর কিছুইনা হোক না সে অবৈধ।

এরপর ড্যাডি সিনেমায় অরুন গাউলির মা বলেন- *"অরুন কোই ছোটামোটা কাম নেহি কারতা"* অর্থ হচ্ছে অরুন গাউলি কোনো ছোট কাজ করেনা সে অনেক বড় গ্যাংস্টার, তাকে ছোটখাটো কিছু ভাবা যাবেনা।

হাসিনা পার্কার এ বলা হচ্ছে- *"আপা ইয়াদ রাহা তো নাম ইয়াদ রাখনেকি জারুরাত নেহি"* অর্থাৎ আপার শব্দটি মনে রাখলেই হবে আর কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নেই। ক্ষমতার ত্রাস প্রতিটি সংলাপের ভেতর নিহিত।

এই সব গুলোই কিন্তু মনোগ্রাহী উক্তি যার দ্বারা সাধারণ মানুষ সিনেমাগুলো দেখে এই বিতর্কিত চরিত্রগুলোর প্রতি আকর্ষিত হবে এবং তাদের প্রতি সম্মানসূচক ভাবের জন্ম নিবে। দর্শকের মনোযোগকে মূল ঘটনা ও বাস্তবতা থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৈতিক ও ধার্মিক অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো হয়। যেমন,রইস সিনেমায় দেখানো হয় রইস এর পোশাক এবং ধর্ম। শিয়া মুসলিম হিসেবে তাকে দেখানো হয় এবং অত্যন্ত ধর্মভীরু হিসেবে দেখানো হয় যে তাজিয়া মিছিলে অংশ নেয়, মায়ের কবর জিয়ারত করে। একইরকম ভাবে 'ড্যাডি' তেও দেখানো হয় অরুন গাউলি শিব-শম্ভু ভক্ত থাকে এবং ধর্মীয় রীতি নীতি মেনে চলে। হাসিনা পার্কারেও একইরকমভাবে দেখানো হয় হাসিনা পার্কার ধার্মিক পোশাক পরিধান করে এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করে। এই জিনিসগুলো দেখানোর কারণই হলো দর্শকের মনোযোগ একটু অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া। তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের এই সকল বিষয়কে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। তিনটি চলচ্চিত্রেই দেখানো হয়েছে তিনজন গ্যাংস্টারই সাধারণ মানুষের নেতা, রবিনহুড। এইধরণের

প্রচারণার কারণ জনমত তৈরি করা যে এই তিনজন গ্যাংস্টার যেই কর্মকান্ডের সাথেই জড়িত থাকুক না কেনো তারা গরীবদের জন্য কাজ করেছে। তাস ভাঁজ করার কৌশলের অর্থ হলো তাস যখন ভাঁজ করা হয় তখন তার একাংশ দেখা যায় পুরোটা না। এই তিনটি সিনেমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রইস, অরুন গাউলি এবং হাসিনা পার্কার এর জীবনের সেই সকল সময়গুলোকে আলোচনায় জায়গা করে দেয়া হয়েছে যেখানে তাদের জীবনের খারাপ দিকগুলো খুবই নগন্য। এছাড়া অপরাধমূলক বিষয়গুলোকেও খুব কম সময় নিয়ে দেখানো হয়েছে বরং তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আবেগনির্ভর জায়গাগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই গবেষণায় তিনটি সিনেমাতেই একই রকম ব্যাখ্যা এবং একই ধরণের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়। এর দ্বারা বার্তা কিন্তু পরিষ্কার। একটি মহল আসলেই চাইছে গণমাধ্যমের সাহায্যে এই গ্যাংস্টারদের প্রতি সাধারণ জনগণের একটা পক্ষপাতিত্ব তৈরি হোক। এর পেছনে রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই লুকায়িত। চলচ্চিত্রের প্রথাগত বর্ণনাত্মক আঙ্গিক এক ধরণের চলচ্চিত্রীয় যুক্তিক্রমের জন্ম দিয়ে থাকে, যা প্রভাবিত করে আবেগকে। (ধীমান, ২০০৭)। এই কথা থেকে বোঝা যায় চলচ্চিত্র যেই যুক্তি দেখাচ্ছে সেটাই দর্শককে প্রভাবিত করে ফেলে। ফলে গ্যাংস্টারদের ভালো লাগা কাজ করা তাদের সমাজের নায়ক হিসেবে চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক।

উপসংহার

বলিউড চলচ্চিত্রের একটি প্রচলিত ধারা হলো নায়কের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ। চলচ্চিত্র তৈরি হয় আবেগ দিয়ে আবার একই সাথে এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও অনেক বেশি জড়িত। তাই গ্যাংস্টারভিত্তিক চলচ্চিত্র যখন নির্মাণ করা হয় কোনোভাবেই একজন নির্দেশক এমন কোন কিছু করতে চাইবেনা যেটার কারণে চলচ্চিত্রটি ব্যর্থ হয়। সিনেমায় সবসময় দুটো বিষয় থাকবেই একটি হলো প্রোটাগনিস্ট এবং আরেকটি হলো অ্যানটাগোনিস্ট। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিই হচ্ছে নায়োকচিত একটা মাত্রা যুক্ত করা। আর তাই গ্যাংস্টার কেন্দ্রিক সিনেমাতে গ্যাংস্টারকে নায়ক হিসেবে মহিমান্বিত করে দেখানোটা তাদের প্রয়োজন কিন্তু এই প্রয়োজন সমাজের ওপর একপ্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং এই ধরণের চলচ্চিত্র প্রচারে ফলে সমাজে নীতি-নৈতিকতার যে একটা সীমারেখা আছে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। গ্যাংস্টার চরিত্র এমনি এমনি বিতর্কিত হয়নি, আর একজন গ্যাংস্টারকে জোড় করে মহিমান্বিত করার কোন মানে আসলে নেই। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে খারাপের মধ্যে ভালো খুঁজতে চাওয়াও অপরাধ।

সাম্প্রতিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের গ্যাংস্টার চরিত্রেগুলোর মহিমান্বিত রূপায়ন সমাজের জন্য অভিশাপস্বরূপ এবং একেবারেই অযৌক্তিক। নানাভাবে প্রচারণার সাহায্য নিয়ে এই তিনটি সিনেমার মধ্য দিয়ে একধরণের ভুল বার্তা প্রচারের অপচেষ্টা চলছে। অপরাধীকে অপরাধ রাজ্যের রাজা বলা যায় কিন্তু নীতি নৈতিকতার মাপকাঠিতে কখনোই তার মাফ নেই। কিন্তু এই তিনটি চলচ্চিত্রে ক্ষেত্রে বাস্তবতা এবং আবেগকে এক করে দেখার একটা প্রয়াস পাওয়া যায়। কারো ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই উৎরাই থাকবে। কিন্তু তার জন্য কোন কেউ অপরাধী হয়ে যাওয়ার পর সেই আবেগকে কেন্দ্র করে জনমনে আকুতি চাওয়ার পেছনে অবশ্যই একধরণের ষড়যন্ত্র তথা বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। জনমনে পক্ষপাতমূলক আচরণ তৈরির লক্ষে এধরণের চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে যার মধ্যে শিক্ষনীয় কিছু পাওয়া যায়না। দেখানো হচ্ছে সহিংসতা আর শেখানো হচ্ছে অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেও কীভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠা যায়। এই ধরণের উপস্থাপন কোনোভাবেই কাম্য নয়।

তথ্যসূত্র

আইজেনস্টাইন, সের্গেই (২০০৭). *ফিল্ম ফর্ম*, (ধীমান দাশগুপ্ত অনুদিত), কলকাতা: বাণীশিল্প।

আউয়াল, সাজেদুল (২০১১). *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

জুনাইদ, নাদির (২০১৭). *প্রতিবাদের নান্দনিকতা: বাংলাদেশের প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র*, ঢাকা: জনান্তিক।

পাণ্ডে, গীতা (২০২১). বলিউড: ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্র গত কয়েক বছরে কতখানি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, বিবিসি নিউজ, ১০ জুন।

ভট্টাচার্য, দেবারতি (২০১৯). "এগিয়েছে বলিউড, হয়েছে আধুনিক", প্রথম আলো বিনোদন, ২৬ ডিসেম্বর।

হক, ফাহমিদুল (২০১১). *অসম্মতি উৎপাদন গণমাধ্যম-বিষয়ক প্রতিভাবনা*, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।

হল, স্টুয়ার্ট (২০১৫). *রেপ্রিজেন্টেশন*, (ফাহমিদুল হক অনুদিত), ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।

হায়দার, শাওন্তী ও সামিন, সাইফুল (২০১৪). *গণযোগাযোগ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট।

Available at: https://www.bbc.com/bengali/news-57431472 (Accessed: 12 October, 2021)

Available at: https://www.prothomalo.com/entertainment/%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%A1-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95 (Accessed: 12 October, 2021)

Available at:https://theculturetrip.com/asia/india/articles/mumbai-the-mafia-and-the-bollywood-trail/ (Accessed: 12 October, 2021)।

Available at: https://www.proquest.com/openview/6fe59255ebdc1d4afb7b3113c56ee490/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1816652 (Accessed: 12 October, 2021)

Available at: https://www.forbes.com/sites/ronakdesai/2016/03/03/bollywoods-affair-with-the-indian-mafia/?sh=1f9b354a4aa6 (Accessed : 12 October, 2021)

Baran, S. J. and Davis, D. K. (2008). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future*, 6th ed. USA: Cengage Learning.

Chomsky, N. and Herman, E. S. (1998). *Manufacturing Consent: The political Economy of Mass Media*, New York: Pantheon Books.

Desai, R. (2016) æBollywood's Affair with the Indian Mafia", *Forbes*, 3 March.

Griffin, E. (2000). *A first look at communication theory*, 4th Ed. Boston: McGraw-Hill.

Lasswell, H. D. (1938). Propaganda Technique in the World War, New York: Pitter Smith.

Lang, G. E. and Lang, K. (1981). Watergate: An exploration of the agenda- building process.In G. C. Wilhoit and Harold de Bock (Ed). Mass Communication Review Yearbook 2. Newbury Park, CA: Sage.

Sinha, S. (2016) Mumbai, æThe Mafia and The Bollywood Trail", Culture Trip, 30 December.

Saran, Renu (2012), History of Indian Cinema, India: Daimond Books.

Sacks, A. (1971) An analysis of the Gangster Movies of the Early Thirties, Proquest.

Zaidi, S. H. 2012. *Dongri to Dubai: Six Decades of the Mumbai Mafia*, India: Lotus collection.

Zaidi, S. H. and Borges, J. 2011. *Mafia Queens of Mumbai: Stories of women from the ganglands*, India: Tranquebar.

Zaidi, S. H. 2013. *Bycullah to Bangkok*, India: HarperCollins.

[Abstract: Indian films have many aspects and genres. A popular trend in Indian cinema these days is gangster based films. In these films gangster characters are presented in a glorified form. Gangsters are those who are involved in various types of criminal activities and immoral activities in the society and who establish and maintain the reign of crime centered around their gangs. There is a recent trend of making gangster characters in a positive way in front of the public through films, maing maximum efforts to glorify them. It is in the minds of the general audience before they even realize that these gangster characters actually have a positive effects on society. But this kind of transformation can play a hidden role in youth society and social degradation.]